সংঘাতের মুখে ইসলাম

মুহাম্মদ আসাদ

সংঘাতের মুখে ইসলাম

মুহম্মদ আসাদ

সৈয়দ আবদুল মান্নান
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচী

প্রকাশকের কথা

আধুনিক সভ্যতার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মুক্ত চিন্তা, বিশ্বায়ন ইত্যাদি নামে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের চার্চ, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রচার মাধ্যমকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত। পশ্চিমা এসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডার জোয়ারে আক্রান্ত আজ মুসলিম বিশ্বও। ইসলাম একটি শাশ্বত জীবনবিধান, যুগ-জিজ্ঞাসা ও মানব জীবনের সার্বিক সমস্যার সমাধান রয়েছে এতে। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ও অজ্ঞতার কারণে অনেকেই পশ্চিমা বিশ্বের প্রচারিত মতবাদই মানুষের মুক্তি, শান্তি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে ভাবতে দ্বিধা করছেন না। ইসলামকে পশ্চিমা বিশ্বের প্রচারিত এসব মতবাদের সামনে দাঁড় করানোর ফলে মুসলিম সমাজেও দেখা দিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট ও চিন্তার নৈরাজ্য। এর ফলে আমাদের সমাজেও ইসলামের শাশ্বত রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা লোপ পেতে যাচ্ছে এবং আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন ভাবধারা। নবদীক্ষিত ইউরোপীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী মুহম্মদ আসাদ তাঁর রচিত 'Islam at the Cross-Roads' বইটিতে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে মানুষের ইতিহাসে আমাদের যুগের মতো এমন অশান্ত যুগ আর আসেনি।' তাঁর মতে পশ্চিমা বিশ্বের প্রচার-প্রপাগাণ্ডার সামনে ইসলামের শাশ্বত বাণী জোরালোভাবে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে সংকট উত্তরণের প্রকৃত উপায়।

লেখক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ইহুদী ও পশ্চিমা বিশ্বের মর্মমূল থেকে এ সত্যে উপনীত হন যে, পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে যেসব প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় লিপ্ত রয়েছে তার অন্তর্নিহিত রহস্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র দীন ইসলামের শাশ্বত বৈশিষ্ট্যকে মানুষের কাছে হীন ও কদর্যভাবে উপস্থাপন করা। 'Islam at the Cross-Roads' বইটিতে তিনি এই ষড়যন্ত্র উত্তরণের জন্য মুসলিম সমাজকে রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ ও কুরআনের শাশ্বত বাণীকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে তুলে ধরার জন্য মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানিয়েছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান চিন্তাবিদ মুহম্মদ আসাদের 'Islam at the Cross-Roads' বইটি 'সংঘাতের মুখে ইসলাম' শিরোনামে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ আবদুল মান্নান।

বইটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশ করে। ব্যাপক পাঠকনন্দিত এ বইটি পুনঃ মুদ্রণ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে জানাচ্ছি অশেষ শুকরিয়া।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল ভাল কাজের জাযাহ্ দান করুন। আমীন।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

গ্রন্থকার পরিচিতি

উনিশ শতকের শেষ দশকে অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পরিবারে লিওপোল্ড উইসের জন্ম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী হয়েও তাঁর যৌবনের জ্ঞান সাধনা পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে তিনি প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো সফর করেন এবং মুসলমানদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে মুসলিম জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। ইউরোপের ব্যস্তসমস্ত যান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত সমাহিত তথা অধিকতর মানবোচিত ইসলামী জীবন-বিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯২৬ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহম্মদ আসাদ তাঁর মুসলিম নাম। কালে জনাব আসাদ মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শের এক অনন্যসাধারণ ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

১৯৩২ সালে তিনি বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে আসেন এবং আল্লামা ইকবালের পরামর্শক্রমে ভাবী ইসলামী রাষ্ট্রের বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামের মৌলিক নীতিগুলোর উদ্ধারে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পশ্চিম পাঞ্জাব সরকার ইসলামী জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে জনাব আসাদকে পরিচালক নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে তিনি লাহোর থেকে Arafat নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্র প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। পরবর্তী কালে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক দফতরের মধ্যপ্রাচ্য বিভাগের প্রধান ও পরে জাতিসংঘে পাকিস্তানের মন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। জনাব আসাদ বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে বর্তমান গ্রন্থ 'Islam at the Cross-Road এবং The Road to Mecca ও The Principles of State and Government in Islam' বিশ্বের চিন্তাশীল মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

অনুবাদকের কথা

আল্লামা মুহম্মদ আসাদ রচিত 'Islam at the Cross-Roads' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৩৪) ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। লেখকের জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ার এক ইহুদী পরিবারে। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে তিনি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। সাংবাদিক হিসাবে তিনি মুসলিম জাহানের প্রায় সবগুলো দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ সফর করে বিশ্বের মুসলিম সুধীমণ্ডলীর সাহচর্য লাভ করেন। দুনিয়ার সকল দেশে মুসলমানদের শোচনীয় অধোগতি লেখককে এর কারণ অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শেষপর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতায় মুগ্ধ হয়ে তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম কবুল করেন।

মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করে তিনি যেমন সাধারণ মরু বেদুঈন থেকে শুরু করে সউদী আরবের সুলতান আবদুল আযীয ইবনে সউদ ও ইরানের শাহানশাহ রেজা শাহ পাহ্লবী পর্যন্ত অসংখ্য বিরাট ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচয় লাভ করেছিলেন; তেমনি কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে বিপুল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন। আল্লামা আসাদ যতোটা লিখেছেন, তার চাইতে পড়েছেন অনেক বেশী। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় এর সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। লেখকের অপর দু'খানি বিখ্যাত পুস্তক 'The Road to Mecca' এবং 'Principles of State and Government in Islam' অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছে।

বইখানি আত্মপ্রকাশের অল্পকাল পরেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় ঘটে এবং ইসলামী জীবন বিধান ও মুসলিম জাহানের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ এবং মুসলিম কওমের আত্মিক পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ ও আগ্রহ আমার মুগ্ধ করে। তখন থেকে বইখানি তরজমা করার জন্য আমার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

বইখানি তরজমা শেষ করার পর বেশ কয়েক বছর তা অপ্রকাশিত থাকে; ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইসলামিক একাডেমী পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় পুরো বইখানি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

অতঃপর ১৯৬৩ সালে এখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়। পরে এর আরও একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করায় আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শুকরিয়া জানাই।

বইখানা মুসলিম সমাজে আদৃত হয়েছে দেখে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করি। আমাদের যুব সমাজের হৃদয়ে ইসলামের আলোক সঞ্চারিত হলেই আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ সাধিত হবে।

—সৈয়দ আবদুল মান্নান

الحمد لله وحده-والصلوة والسلام على من لانبى بعده .

বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে মানুষের ইতিহাসে আমাদের যুগের মতো এমন অশান্ত যুগ আর আসে নি কখনো। আমাদের সামনে আসছে এমন অসংখ্য সমস্যা, যার নতুন ও অভূতপূর্ব সমাধানের প্রয়োজন হচ্ছে। তা ছাড়া যে দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব সমস্যা এসে হাজির হচ্ছে আমাদের সামনে, তা'ও এতোকালের অভ্যস্ত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। সব দেশের সমাজে আসে মৌলিক পরিবর্তন। যে গতিতে এইসব পরিবর্তন ঘটে, প্রত্যেক দেশেই তার ধরন আলাদা; কিন্তু প্রত্যেক জায়গায়ই আমরা সেই একই গতিশীল উদ্যম লক্ষ্য করি, যাতে বিরতি বা দ্বিধার অবকাশ থাকে না।

ইসলামী জাহানেও এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নেই। এখানেও পুরনো রীতি ও ধারণা লোপ পেয়ে যাচ্ছে, আর আত্মপ্রকাশ করছে নতুন নতুন রূপ। এই ক্রমবিকাশের পরিণতি কি? কতো গভীরে প্রবেশ করছে এ পরিবর্তন? ইসলামের সাংস্কৃতিক লক্ষ্যের সাথে কতোটা খাপ খাচ্ছে এসব ক্রমবিকাশ?

এর সবগুলো প্রশ্নের ব্যাপক জওয়াব এখানে দেওয়া সম্ভব হবে না। সীমাবদ্ধ স্থানের দরুন মুসলিম সমাজের সামনে উপস্থিত সমস্যাগুলোর মধ্যে মাত্র একটির আলোচনা করা হবে এখানে। সেটি হচ্ছে পশ্চিমী সভ্যতার প্রতি মুসলিম জাহানের মনোভাব কেমন হওয়া দরকার। বিষয়টির ব্যাপক গুরুত্বের দরুন অবশ্যি ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, বিশেষ করে সুন্নাহ্‌র নীতি সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনা করা দরকার হবে। যে বিষয়ের আলোচনায় বহু বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন, তার আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের পক্ষে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার বেশী কিছু করা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও অথবা হয়তো সেই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা অন্যান্য লোককে এই সর্বাধিক জরুরী বিষয়টির দিকে অধিকতর চিন্তা নিয়োগে উৎসাহিত করবে।

এখন আমার নিজের কথা বলছি, কারণ কোনো নবদীক্ষিত মুসলমান কথা বলতে গেলে মুসলমানদের জানবার অধিকার আছে, কেন সে ইসলাম কবুল করল।

১৯২২ সালে কয়েকটি বিশিষ্ট ইউরোপীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে আফ্রিকা ও এশিয়া সফর করার জন্য আমি আমার স্বদেশ অস্ট্রিয়া ছেড়ে রওয়ানা হই। তখন থেকে শুরু করে আমার প্রায় সময় কেটেছে ইসলামী প্রাচ্য দেশগুলোতে। যেসব জাতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল, গোড়ার দিকে তাদের

সম্পর্কে আমার মনোযোগ ছিল নিছক বাইরের লোকেরই মতো। আমি আমার সামনে দেখতে পেলাম ইউরোপীয় থেকে আলাদা ধরনের এক সমাজ বিধান ও জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি; এবং গোড়া থেকেই ইউরোপের ব্যস্তসমস্ত যান্ত্রিক জীবন-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর শান্ত-সমাহিত করা অধিকতর মানবোচিত জীবন বিধানের প্রতি আমার মনে জাগল একটা সহানুভূতির ভাব। এই সহানুভূতি আমায় ক্রমে ক্রমে এ বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করল এবং আমি মুসলিমদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে উঠলাম। এই সময়টায় সে মনোযোগ আমায় ইসলামের গণ্ডির মধ্যে টেনে নেবার মতো বলিষ্ঠ ছিল না, কিন্তু এর ফলে আমার সামনে এমন এক প্রগতিশীল মানব-সমাজের সম্ভাবনার নতুন পথ খুলে গেল যা ন্যূনতম আভ্যন্তরীণ সংঘাত ও সর্বাধিক পরিমাণ খাঁটি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব দ্বারা সুসংহত। আজকের দিনের মুসলিম-জীবনের বাস্তব অবস্থা অবশ্য আমার কাছে মনে হল ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষার প্রদত্ত আদর্শ সম্ভাবনা থেকে বহু দূরে। ইসলামের যা কিছু ছিল প্রগতি ও গতিচাঞ্চল্য, মুসলমানদের মধ্যে তা পরিণত হয়েছে নিষ্ক্রিয়তা ও স্থবিরতায়; যা কিছু ছিল মহত্ত্ব ও আত্মত্যাগের প্রস্তুতি, বর্তমানের মুসলিম জীবনে তা নেমে গেছে সংকীর্ণ মানসিকতা ও সহজ জীবন যাপনের প্রতি লোভের পর্যায়ে।

এই তথ্যোদ্‌ঘাটন দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সুস্পষ্ট অসামঞ্জস্যে হতভম্ব হয়ে আমি আমার সামনে উপস্থিত সমস্যাকে আরো ঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবার চেষ্টা করলাম; মানে, আমি নিজকে ইসলামের গণ্ডির মধ্যে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। এটা ছিল নিছক বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত পরীক্ষার ব্যাপার; এবং এর ফলে অল্পকালের মধ্যে আমার কাছে সঠিক সমাধান ধরা পড়ল। আমি উপলব্ধি করলাম যে, মুসলিমদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পতনের একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তারা ধীরে ধীরে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষার প্রাণবস্তুর অনুসরণে বিরত হয়েছে। ইসলাম এখনো রয়েছে; কিন্তু তা হচ্ছে একটি প্রাণহীন দেহ। যেসব উপাদান একদা মুসলিম জাহানের শক্তির উৎস ছিল, বর্তমানে তাই হচ্ছে তার দুর্বলতার কারণ; ইসলামী সমাজ শুরু থেকেই গড়ে উঠেছিল কেবল ধর্মীয় বুনিয়াদের উপরে এবং আজ এই বুনিয়াদের দুর্বলতাই স্বাভাবিকভাবে তার সাংস্কৃতিক কাঠামোকে দুর্বল করছে—এবং সম্ভবত পরিণামে তার ধ্বংসও এনে দিতে পারে।

ইসলামের শিক্ষা কতোটা মজবুত আর কতোটা বাস্তব, এই সত্য আমি যতো বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগলাম, ততোই আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা তীব্র হয়ে উঠতে লাগল, কেন মুসলিমরা তাদের বাস্তব জীবনে এর পূর্ণ প্রয়োগে বিরত হল। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে পামির এবং বসফোরাস থেকে আরব সাগরের মধ্যবর্তী প্রায় সবগুলো দেশের চিন্তাশীল মুসলমানের সঙ্গে আমি এ সমস্যার আলোচনা করেছি।

ক্রমে সমস্যাটি আমার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কারের মতোই হয়ে উঠল এবং পরিণামে মুসলিম জাহান সম্পর্কে আমার বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত অন্যবিধ সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার অন্তরের জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে এমন বলিষ্ঠ হয়ে উঠল যে, অমুসলিম আমি মুসলিমদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করলাম, যেন আমি তাদের অবহেলা ও নিষ্ক্রিয়তার হাত থেকে ইসলামকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আমার এ অগ্রগতি ছিল আমার অনুভূতির বাইরে। অবশেষে একদিন ১৯২৫ সালের শরৎকালে আফগানিস্তানের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক তরুণ প্রাদেশিক গভর্নর আমায় বলে বসলেন, "কিন্তু আপনি যে মুসলিম, তা কেবল আপনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না।" তাঁর কথাটি আমার অন্তরে বিঁধলো এবং আমি নীরব হয়ে থাকলাম। কিন্তু ১৯২৫ সালে যখন আমি আবার ইউরোপে ফিরে এলাম, তখন আমার মনে হল যে, আমার মনোভাবের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পরিণাম হতে পারে ইসলাম কবুল করা।

মুসলিম হওয়া সম্পর্কে আমার বক্তব্য এ পর্যন্তই। তখন থেকে বারংবার আমার কাছে প্রশ্ন এসেছে, "কেন আপনি ইসলাম কবুল করলেন?" কোন্ জিনিসটি বিশেষ করে আপনাকে আকর্ষণ করেছিল? এবং আমায় স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে, আমি কোনো সন্তোষজনক জওয়াব দিতে পারছি না। কোনো বিশেষ শিক্ষাই আমার আকর্ষণ করে নি, বরং সমগ্র আশ্চর্যজনক অবর্ণনীয়রূপে সুসংবদ্ধ নৈতিক শিক্ষার কাঠামো ও বাস্তব জীবনের কার্যসূচীই আমায় মুগ্ধ করেছিল। এখনো আমি বলতে পারি না, কোন্ বৈশিষ্ট্যটি অপর কোনটির তুলনায় আমার কাছে বেশী ভালো লাগে। আমার কাছে ইসলাম এক কুশলী স্থপতির পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির মতো। এর সবগুলো অংশই পরস্পরকে পূর্ণ ও মজবুত করে তোলার জন্য হিসাব করে তৈরি; এতে নেই কোনো বাড়তি, নেই কোনো ঘাটতি; ফলে এর মাঝে রয়েছে পূর্ণ ভারসাম্য আর মজবুত স্থিরতা। ইসলামের শিক্ষা ও সত্যের প্রত্যেকটির যথাযোগ্য অবস্থানই সম্ভবত আমার মনের উপর বলিষ্ঠতম রেখাপাত করেছিল। এর সাথে আরো অনেক ধারণা হয়তো ছিল, কিন্তু আজ তা বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে কঠিন। সর্বোপরি, এর ভিতরে ছিল একটা প্রেমের ব্যাপার; আর প্রেম হচ্ছে অনেক কিছুর সংমিশ্রণ—আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের নিঃসঙ্গতা, আমাদের উচ্চ লক্ষ্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমাদের শক্তি ও দুর্বলতার সংমিশ্রণ। আমার বেলায়ও তাই ঘটেছিল। রাত্রির অন্ধকারে গৃহপ্রবেশকারী দস্যুর ন্যায় ইসলাম অনুপ্রবেশ করেছিল আমার মধ্যে; কিন্তু দস্যুর মতো পালিয়ে না গিয়ে সে থেকে গেল চিরকালের জন্য।

তখন থেকে শুরু করে আমি ইসলাম সম্পর্কে যথাসাধ্য শিখবার চেষ্টা করেছি। আমি কুরআন শরীফ ও হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর হাদীস অধ্যয়ন করেছি, ইসলামের ভাষা ও ইতিহাস পাঠ করেছি এবং ইসলাম সম্পর্কে ও তার বিরুদ্ধে লিখিত

রচনাসমূহ যথেষ্ট অধ্যয়ন করেছি। আরবী-নবী যে মূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন, সে সম্পর্কে কতকটা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আমি পাঁচ বছরের অধিক সময় কাটিয়েছি নযদ ও হিজাযে—বিশেষ করে আল্-মদীনায়। হিজায বহু দেশের মুসলিমদের এক মিলনকেন্দ্র; তাই সেখানে আমি বর্তমান যুগে ইসলামী জাহানে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে সক্ষম হয়েছি। এই অধ্যয়ন ও তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ আমার মনে এই সুদৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করেছে যে, মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুন পিছিয়ে পড়া সত্ত্বেও ইসলাম আত্মিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবহমানকাল ধরে মানব জাতির কাছে আগত গতিশীল সঞ্জীবনী শক্তির মধ্যে সর্বোত্তম; এবং এই সময় থেকেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ ইসলামের পুনর্জাগরণের সমস্যার চারদিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

এ আলোচনা সেই মহান লক্ষ্যের পথে আমার দীন তোহফা। এতে সম্পূর্ণ পরিস্থিতির নিরপেক্ষ বর্ণনার দাবি করা হচ্ছে না; এতে রয়েছে ইসলাম বনাম পশ্চিমী সভ্যতার বিরোধ সম্পর্কে আমার জবানবন্দী। এ আলোচনা তাঁদের জন্য নয়, যাঁদের কাছে ইসলাম মাত্র সমাজ-জীবনের বহুবিধ কম-বেশী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্যতম; বরং এ হচ্ছে তাঁদেরই জন্য, যাঁদের অন্তরে এখনো প্রজ্বলিত রয়েছে সেই অগ্নিশিখা, যা একদিন দগ্ধ করে সোনায় পরিণত করেছিল হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আসহাবে কিরামকে; যে অগ্নিশিখা সমাজ বিধান ও সাংস্কৃতিক অবদান হিসাবে ইসলামকে মহান করে তুলেছিল একদিন।

ইসলামের মুক্ত পন্থা

বর্তমান যুগের চলতি শ্লোগানসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে 'মহাশূন্য বিজয়' (Conquest of Space)। আগেকার লোকেরা ভাবতেও পারত না, এমনি সব যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে; এবং এসব পথ ধরে মানব-ইতিহাসে অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে ও ব্যাপকভাবে পণ্য চলাচল হচ্ছে। এই পরিস্থিতির ফল হয়েছে বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা। কোনো একটি জাতি বা দল আজ বাকি দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি স্থানের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। তার প্রকৃতি হয়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপক। প্রবণতার দিক দিয়ে তা রাজনৈতিক সীমারেখা ও ভৌগোলিক দূরত্বকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার বস্তুবাদী দিক থেকেও সম্ভবত বেশী জরুরী দিক হচ্ছে এই যে, এর সাথে সাথে কেবল পণ্যের স্থানান্তরই হচ্ছে না, বরং চিন্তাধারা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরও স্থানান্তর হচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি পাশাপাশি চললেও তাদের চলমান বিধির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থনীতির প্রাথমিক বিধান অনুযায়ী জাতিসমূহের মধ্যে পণ্য বিনিময় পারস্পরিক হয়ে থাকে; তার মানে, কোনো বিশেষ জাতি বরাবরের জন্য ক্রেতা এবং অপর জাতি বিক্রেতা হতে পারে না; পরিণামে প্রত্যেক জাতিকে একই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপরের মাধ্যমে অর্থনীতি ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার উভয় ভূমিকাতে অভিনয় করতে হবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিনিময়ের এ কঠোর বিধি অনুসরণের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, অন্তত তেমন কোনো প্রয়োজন দৃশ্যমান হয় না; এর মানে, ধারণা ও সাংস্কৃতিক প্রভাবের স্থানান্তর যে আদান-প্রদানের ভিত্তিতেই হবে, এমন কোনো কথা নেই। এটা মানব-প্রকৃতির শামিল যে, যে-সব জাতি ও সভ্যতা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অধিকতর বলিষ্ঠ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা কম কর্ম-প্রবণ সম্প্রদায়ের উপর তারা বলিষ্ঠ মোহ বিস্তার করে এবং নিজেরা প্রভাবিত না হয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। পশ্চিমী ও মুসলিম জাহানের জাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আজ অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে মুসলিম জাহানের উপর পশ্চিমী সভ্যতার যে বলিষ্ঠ একদেশদর্শী প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে, তাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই; কেননা, এ হচ্ছে এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি এবং এর সাদৃশ্য অন্যত্রও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা এতে খুশী হলেও আমাদের জন্য সমস্যাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। আমরা যারা কেবল নিরপেক্ষ দর্শকই নই, বরং এই নাট্যাভিনয়ের অতি বাস্তব অভিনেতা—যারা নিজেদেরকে মনে করি হযরত রাসূলে করীম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর উম্মত, তাদের কাছে প্রকৃতপক্ষে এখানেই সমস্যার শুরু। আমরা বিশ্বাস করি যে, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাঠামোর সাথে খাপখাইয়ে নেবার মতো নিছক মানসিক প্রবণতা মাত্র নয়, বরং ইসলাম হচ্ছে সংস্কৃতির এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ এবং সুস্পষ্ট ও নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক সমাজ বিধান। আজকের দিনের মতো যখন কোনো বিদেশী সভ্যতার দীপ্তি আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক গঠনে কোনো রকম পরিবর্তন ঘটায়, তখন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে, সেই বিদেশী প্রভাব আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সম্ভাবনার অনুকূল, না তার বিরোধী; ইসলামী তমদ্দুনের ক্রমবিকাশে তা সহায়ক হবে, না বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

কেবল বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এ প্রশ্নের জওয়াব পাওয়া যেতে পারে। ইসলামী ও আধুনিক পাশ্চাত্যে উভয় সভ্যতার মূল চালক শক্তি (motive forces) আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং অনুসন্ধান করতে হবে, তাদের মধ্যে কতোটা সহযোগিতা সম্ভব। যেহেতু ইসলামী সভ্যতা অপরিহার্যরূপে ধর্মীয়, তাই আমাদেরকে সবার আগে মানব জীবনে ধর্মের স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করতে হবে।

আমরা যাকে 'ধর্মীয় মনোভাব' বলি, তা হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিগত ও জীবতাত্ত্বিক গঠনের স্বাভাবিক পরিণতি। মানুষ নিজকে জীবন-রহস্য, জন্মমৃত্যুর রহস্য এবং অসীমত্ব অনন্তকালের রহস্য বোঝাতে অক্ষম। তার যুক্তি-ক্ষমতা দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রতিহত হয়। সুতরাং সে মাত্র দু'টি কার্য করতে পারে। এক হচ্ছে সমগ্রভাবে জীবনকে বুঝবার সকল চেষ্টা ত্যাগ করা। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ নির্ভর করবে কেবল তার বাইরের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের উপর এবং তারাই ভিতর ভিতর সিদ্ধান্ত সীমাবদ্ধ করবে। এইভাবে সে জীবনের একটি মাত্র ভগ্নাংশকে উপলব্ধি করতে পারবে—যা প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অনুপাতে সংখ্যা ও স্বচ্ছতার দিক দিয়ে দ্রুত বা ধীর গতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তা সব সময়ে সেই ভগ্নাংশই থাকবে এবং 'সামগ্র্যে'র উপলব্ধি থাকবে মানবীয় যুক্তির পদ্ধতিগত প্রয়োগ-ক্ষমতার বাইরে।

এই পথেই চলছে প্রকৃতি-বিজ্ঞান। অপর যে সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার পাশাপাশি চলতে পারে, তা হচ্ছে ধর্মের পথ। এতে মানুষকে আত্মিক এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সহজাত অভিজ্ঞতা দিয়ে জীবনের একাত্মক ব্যাখ্যার স্বীকৃতির দিকে চালিত করে। সাধারণভাবে তার মূলে থাকে এই ধারণা যে, সর্বোপরি এমন এক সৃষ্টিধর্মী শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে, যা মানব-জ্ঞানের অতীত কোন পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র বিশ্বজগৎকে পরিচালনা করছে। যে ধারণার কথা এখানে বলা হল, তা মানুষকে জীবনের বাহ্যত দৃশ্যমান তথ্য ও অংশ সম্পর্কে অনুসন্ধানে বাধা দেয় না। বাইরের (বৈজ্ঞানিক) ও ভিতরের (ধর্মীয়) ধারণার মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বরং অস্তিত্ব ও চালক-শক্তির (motive power) সমন্বয় হিসাবে, সোজা কথায় ভারসাম্যযুক্ত সুসামঞ্জস্য 'সামগ্র্য' হিসাবে সকল জীবনকে উপলব্ধি করবার একমাত্র চিন্তামূলক সম্ভাবনা এই শেষোক্ত ধারণাতেই নিহিত রয়েছে। 'সুসমঞ্জস' (harmonious) কথাটি ভয়ানক অপপ্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কথাটি দ্বারা মানুষের নিজের মধ্যেও অনুরূপ মনোভঙ্গি বুঝায়। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জানেন যে, তাঁর আশেপাশে ও নিজের মধ্যে যা কিছু ঘটছে তা কখনো কখনো শক্তির চেতনা ও উদ্দেশ্য-বর্জিত অন্ধ খেলার ফল হতে পারে না; তাঁর বিশ্বাস, এর সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর সচেতন ইচ্ছার পরিণতি এবং সেই কারণে মৌলিকভাবে বিশ্বজনীন পরিকল্পনারই অংশ। এমনি করেই মানুষ মানবাত্মা এবং প্রকৃতি নামে অভিহিত ঘটনাপ্রবাহ ও দৃশ্যময় বাহ্য পৃথিবীর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সক্ষম হয়। আত্মার সর্বপ্রকার যান্ত্রিক গঠন, সকল আকাঙ্ক্ষা ও ভীতি, অনুভূতি ও কল্পনাজাত অনিশ্চয়তা নিয়ে মানুষ মোকাবেলা করে সেই প্রকৃতির— যার ভিতরে প্রাচুর্য ও নির্মমতা, বিপদ ও নিরাপত্তার সংমিশ্রণ হয়েছে বিচিত্র অবর্ণনীয় পন্থায়, এবং যা স্পষ্টত মানব-মনের পদ্ধতি ও কাঠামো থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় কার্য করে যাচ্ছে। নিছক বুদ্ধিবৃত্তিজাত দর্শন বা ভূয়োদর্শনসঞ্জাত বিজ্ঞান কখনো এ দ্বন্দ্বের সমাধান করতে সক্ষম হয় নি। আজ ঠিক এই পথ দিয়েই ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মানবের স্বয়ংসচেতন আত্মা এবং মূক ও আপাত-দায়িত্ববর্জিত প্রকৃতি আনীত হয়েছে এক আত্মিক ঐক্যের সম্পর্কে; কারণ মানুষের ব্যক্তিগত চেতনা এবং তার চারদিকে ও তার ভিতরে পরিব্যাপ্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র হলেও উভয়ই এক অভিন্ন সৃষ্টিধর্মী ইচ্ছার সুসংহত প্রকাশ। এমনি করে ধর্ম মানুষকে যে অজস্র কল্যাণ দান করেছে, তা হচ্ছে এই উপলব্ধি যে, 'সে হচ্ছে সৃষ্টির চিরন্তন

গতিপ্রবাহের এক সুপরিকল্পিত অংশ; বিশ্বজগতের পরিণতির অসীম সংগঠনের একটি নির্দিষ্ট অংশ এবং কখনো-সে তা না হয়ে পারে না।' এই ধারণার মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম আত্মিক নিরাপত্তার এক গভীর অনুভূতি—যা আশা ও ভীতির মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে এবং এতেই সূচিত হয় ধর্মবিমুখ থেকে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পার্থক্য; তা সে ধর্মই অনুসরণ করুক না কেন।

প্রধান প্রধান ধর্মবিধানসমূহের নির্দিষ্ট মতবাদ যাই হোক না কেন, তাদের মৌলিক অবস্থা সাধারণ। মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রকাশ্য ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন সব ধর্মেই সমভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই বাচনিক বিশ্লেষণ ও নির্দেশ দানের বাইরে তার কার্যক্রম বিস্তার করে। এতে আমাদেরকে কেবল এই শিক্ষাই দেয় না যে, সমগ্র জীবন এক অপরিহার্য ঐক্য—কারণ আল্লাহ্‌র একত্ব থেকেই এর উদ্ভব,—বরং এতে আমাদেরকে সেই বাস্তব পন্থাও দেখিয়ে দেয়,—কি করে আমাদের প্রত্যেকেই তার ব্যক্তিগত পার্থিব জীবনের সীমানার মধ্যে তার অস্তিত্ব ও চেতনার ভিতরে ধারণা ও কর্মের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বোপরি, জীবনের এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে কোনো মানুষ দুনিয়াকে অস্বীকার করতে বাধ্য হয় না; আত্মিক পবিত্রতার গোপন দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য কোনো কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন হয় না; আত্মার মুক্তির উদ্দেশ্যে ধারণা-শক্তির অতীত কোনো মতবাদে বিশ্বাস করার জন্য মনের উপর চাপ পড়ে না। এই সব জিনিস সম্পূর্ণরূপে ইসলামের বহির্ভূত, কারণ ইসলাম একটি ভাববাদী মতবাদ অথবা দর্শন নয়। এ হচ্ছে সোজাসুজি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির জন্য তাঁরই নির্ধারিত প্রকৃতির বিধি অনুসারে জীবনের একটি কর্মসূচী এবং এর সর্বোত্তম লক্ষ্য হচ্ছে মানব-জীবনের আত্মিক ও বাস্তব দিকের পূর্ণ সমন্বয় বিধান। ইসলামের শিক্ষায় মানুষের দৈহিক ও নৈতিক অস্তিত্বের মধ্যে কোনরূপ আভ্যন্তরীণ সংঘাতের অবকাশ না রেখে কেবল উভয় দিকের মধ্যে পারস্পরিক আপোস বিধানই করা হয় নি। বরং জীবনের স্বাভাবিক বুনিয়াদ হিসাবে তাদের সহ-অবস্থান এবং অবিচ্ছেদ্যতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আমার মনে হয়, এ কারণেই ইসলামী ইবাদতের বিচিত্র রূপের মধ্যে মানসিক একাগ্রতা ও বিশেষ অঙ্গভঙ্গির পারস্পরিক সমন্বয় বিধান করা হয়েছে। ইসলামবিরোধী সমালোচকরা কখনো কখনো প্রার্থনার এই বিশেষ ধরনকে তাদের অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে পেশ করে বলে থাকেন যে, ইসলাম আনুষ্ঠানিকতা ও বাইরের প্রদর্শনীর ধর্ম। গোয়ালা যেমন করে দুধ থেকে মাখন আলাদা করে ফেলে, তেমনি করে অন্য ধর্মের যে সব লোকেরা 'আত্মিক' থেকে 'দৈহিক' দিককে পরিষ্কার আলাদা করে দেখতে

অভ্যস্ত, তারা খুব সহজে বিশ্বাস করতে পারে না যে, ইসলামের অমিশ্রিত দুগ্ধে এই উভয় দিক নিজ নিজ গঠনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র হলেও পরস্পর সুসমঞ্জসভাবে বিরাজ ও আত্মপ্রকাশ করছে। অন্য কথায় ইসলামী প্রার্থনায় মানসিক একাগ্রতা ও দৈহিক অঙ্গভঙ্গির একত্র-সমাবেশ হয়েছে; কারণ, মানব-জীবনের গঠনও ঠিক অনুরূপ এবং আরো ধারণা করা হয় যে, আমরা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সর্ববিধ শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমেই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করব।

এই মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই, তওয়াফ অনুষ্ঠানের মধ্যে। তওয়াফ মানে মক্কায় কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করা। যেহেতু পবিত্র নগরীতে প্রবেশকারী হাজীদের জন্য কা'বা শরীফের চারদিকে সাতবার ঘুরে আসা বাধ্যতামূলক এবং মক্কায় হজ্জব্রত উদ্‌যাপনের তিনটি অপরিহার্য কর্তব্যের মধ্যে এ অনুষ্ঠানটি অন্যতম, সেই কারণেই আমাদের মধ্যে এ জিজ্ঞাসা জাগা স্বাভাবিক : এর অর্থ কি? এমনি আনুষ্ঠানিক পন্থায় ভক্তিপ্রকাশ করা কি প্রয়োজনীয়?

এর জওয়াব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একটি বিশেষ বস্তুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আমরা তাকে আমাদের কর্মের কেন্দ্রবস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করি। যে কাবা শরীফের দিকে প্রত্যেক মুসলিম নামাযের সময়ে তার মুখ ফিরায়, তা আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতীক হিসাবেই গণ্য হয়। তওয়াফে হাজীর দৈহিক অঙ্গচালনা মানব-জীবনে কর্মের প্রতীক। সুতরাং তওয়াফের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কেবল আমাদের ভক্তিমূলক চিন্তায় নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনে, আমাদের ধর্মে ও প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌ ও তাঁর একত্বের ধারণা কেন্দ্রবস্তু হিসাবে থাকবে, কারণ আল্লাহ্‌ তা'আলা কুরআন মজীদে বলেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۔

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল এইজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।" (সূরা ৫১ : ৫৬)

সুতরাং এই 'ইবাদত' বা উপাসনার ধারণা ইসলামে অন্য ধর্ম থেকে আলাদা। এখানে তা কেবল নামায বা রোযার মতো ভক্তিমূলক কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার প্রসার হচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে। যদি সমগ্রভাবে আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় আল্লাহ্‌র ইবাদত, তা হলে আমাদের জীবনকে সকল দিকের সমন্বয়ে স্বাভাবিকভাবেই এক জটিল নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এমনি করে আমাদের জীবনের তুচ্ছতম কাজগুলো সহ সব রকম কার্যকেই আল্লাহ্‌র ইবাদত হিসাবে সম্পন্ন করতে হবে; অর্থাৎ, আমাদেরকে তা করতে হবে আল্লাহ্‌র বিশ্বজনীন

পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সচেতনভাবে। এই ধরনের কার্যক্রম সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষের কাছে মনে হবে একটি সুদূরপ্রসারী আদর্শ; কিন্তু আদর্শকে বাস্তব অস্তিত্বে রূপান্তরিত করাই কি ধর্মের উদ্দেশ্য নয়?

এদিক দিয়ে ইসলামের মর্যাদা অভ্রান্ত। প্রথমত, ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মানব-জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র স্থায়ী ইবাদতই হচ্ছে এই জীবনের অর্থ; দ্বিতীয়ত, এই লক্ষ্য অর্জন করা ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব, যতক্ষণ আমরা আমাদের জীবনকে আত্মিক ও বাস্তব—দু'ভাগে বিভক্ত করি; আমাদের চেতনায় ও আমাদের কর্মে এই উভয় দিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে এক সুসমঞ্জস সত্তা। আমাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র একত্বের ধারণার প্রতিফলন হবে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিকের সমন্বয় ও ঐক্য বিধানের প্রচেষ্টার ভিতরে।

এই মনোভাবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে ইসলাম ও অন্যান্য পরিচিত ধর্মপদ্ধতির মধ্যে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি। এই বৈষম্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই সত্যের মধ্যে যে, শিক্ষা হিসাবে ইসলাম কেবল মানুষ ও তার স্রষ্টার মধ্যে দার্শনিক সম্পর্ক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয় ব্যক্তি ও তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার মধ্যকার পার্থিব সম্পর্কের উপর। পার্থিব জীবনকে শূন্যগর্ভ শুক্তি বা পরবর্তী আখেরাতের জীবনের অর্থহীন প্রতিচ্ছায়া মনে করা হয় না; বরং তাকে মনে করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ অনন্যসাপেক্ষ সত্তা হিসাবে। আল্লাহ্ নিজে আহাদ বা একক—কেবল অস্তিত্বে নয়, উদ্দেশ্যেও; সুতরাং তাঁর সৃষ্টিও একক, সম্ভবত অস্তিত্বের দিক দিয়েও, উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তো বটেই।

আল্লাহ্‌র ইবাদতের যে ব্যাপক ধারণার বিশ্লেষণ উপরে করা হল, ইসলামে তাই হল মানব জীবনের তাৎপর্য। এই ধারণাই ব্যক্তিগত পার্থিব জীবনের মানুষে পূর্ণতায় পৌছবার সম্ভাবনার পথ প্রদর্শন করে। সকল ধর্মীয় পদ্ধতির মধ্যে একমাত্র ইসলামই ঘোষণা করে যে, "পার্থিব অস্তিত্বে মানুষের ব্যক্তিগত পূর্ণতালাভ সম্ভব।" খ্রিস্টধর্মের শিক্ষার ন্যায় ইসলাম তথাকথিত 'দৈহিক' কামনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করে না; অথবা হিন্দুধর্মের মতো ক্রমাগত উচ্চতর পর্যায়ে জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতি দেয় না; অথবা বৌদ্ধধর্মের সাথেও ইসলাম একমত নয়, যেখানে কেবল ব্যক্তিগত আত্মার নির্বাণ ও পৃথিবীর সাথে তার মানসিক আবেগ-প্রধান সংযোগের পরিসমাপ্তির মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ ও মুক্তি অর্জন সম্ভব হতে পারে। না— ইসলাম বলিষ্ঠভাবে স্বীকৃতি দান করে যে, মানুষ তার পার্থিব ব্যক্তিগত জীবনে তার জীবনের যাবতীয় পার্থিব সম্ভাবনার পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারাই পূর্ণতায় পৌছতে পারে।

ভ্রান্তিমূলক ধারণা এড়াবার জন্য 'পূর্ণতা' কথাটি যে অর্থে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে, তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যতোক্ষণ আমরা জীবতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধ মানব সম্পর্কে আলোচনা করি, সম্ভবত ততোক্ষণ আমরা 'অবিমিশ্র' (absolute) পূর্ণতার ধারণা বিবেচনা করতে পারি না; কারণ যা কিছু অবিমিশ্র, তা কেবল খোদায়ী গুণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানবীয় পূর্ণতার সত্যিকার মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক ধারণার আপেক্ষিক ও নিছক ব্যক্তিগত তাৎপর্য থাকবেই। এতে সর্বপ্রকার চিন্তনীয় গুণরাজির অধিকার, অথবা এমন কি, ক্রমাগত বইরের নতুন নতুন গুণের অধিকার অর্জন বুঝায় না; বরং ব্যক্তির ভিতরে ইতোমধ্যেই যে-সব গুণের অস্তিত্ব রয়েছে, কেবলমাত্র তারই পূর্ণ বিকাশ বুঝায়— যাতে করে তার অন্তর্নিহিত ঘুমন্ত শক্তিসমূহের জাগরণ সম্ভব হয়। জীব-প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সহজাত গুণেরও বৈষম্য আছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অমূলক যে, সকল মানুষই এক ধরনের 'পূর্ণতা' লাভ করবে বা করতে পারবে— যেমন অমূলক একটি পূর্ণগুণসম্পন্ন দৌড়ের ঘোড়া ও একটি পূর্ণগুণসম্পন্ন ভারবাহী ঘোড়ার মধ্যে ঠিক একই ধরনের গুণের প্রত্যাশা করা। উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক হতে পারে; কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকবে, কারণ তাদের মূল স্বভাবে পার্থক্য রয়েছে। মানুষের বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। পূর্ণতা যদি একটি বিশেষ 'ধরনের' মাপকাঠিতে পরিমাপ করা হয়, যেমন খ্রিস্টধর্মে কঠোরব্রতী সিদ্ধপুরুষ ধরনের লোককেই ধরা হয়ে থাকে, তা হলে মানুষকে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বর্জন, পরিবর্তন অথবা দমন করতে হবে। কিন্তু এর ফলে এই দুনিয়ার সকল জীবনের নিয়ন্তা, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের আল্লাহ্‌র কানুনকে সুস্পষ্টভাবে অমান্য করা হবে। সুতরাং ইসলাম দমননীতির ধর্ম নয় বলেই মানুষকে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বে এতোটা সুযোগ দান করে, যাতে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারে তার বিভিন্ন প্রকার গুণ, প্রকৃতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবৃত্তির সুনির্দিষ্ট বিকাশ সম্ভব হতে পারে। । এমনি করে কোনো ব্যক্তি কঠোরব্রতী সাধকও হতে পারে অথবা আইনের গণ্ডির মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভাবনাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতেও পারে; সে হতে পারে মরুচারী বেদুঈন—যার আগামী কালের খাদ্যের সংস্থান নেই, অথবা চারদিকে পণ্য পরিবেষ্টিত সম্পদশালী ব্যবসায়ী। যতোদিন সে আন্তরিকতা ও চেতনা সহকারে আল্লাহ্‌র বিধানের কাছে নতি স্বীকার করে, ততোদিন তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে যে-কোনো ধারায় তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ করবার স্বাধীনতা থাকবে। তার কর্তব্য হচ্ছে নিজকে সবচাইতে ভালো করে গড়ে তোলা, যাতে সে তার জীবনে স্রষ্টার প্রদত্ত কল্যাণকর দানের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এবং নিজস্ব জীবনের পূর্ণ বিকাশ সাধন দ্বারা তার চারদিকের সকল মানুষের আত্মিক, সামাজিক ও বাস্তব

সর্ববিধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে পারে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত জীবনের রূপ কোনো বিশেষ মান দ্বারা নির্ধারিত নয়। তার সামনে যে অসংখ্য অন্তহীন বিধানসঙ্গত সম্ভাবনার পথ খোলা রয়েছে, তার ভিতরে যে-কোনো পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা তার আছে।

ইসলামের এই 'উদারনৈতিকতার' (liberalism) ভিত্তি হচ্ছে এই ধারণা যে, মানুষের মূল প্রকৃতি অপরিহার্যরূপে সৎ। খ্রিস্টধর্মের ধারণা অনুসারে যেমন মানুষ পাপী হয়েই জন্মে, অথবা হিন্দুধর্মের শিক্ষা অনুসারে সে যেমন মৌলিক দিক দিয়েই নীচ ও অপবিত্র এবং পূর্ণতার লক্ষ্যে পৌছবার জন্য তাকে ক্রমাগত বেদনাদায়ক জন্মান্তরের পথ অতিক্রম করতে হয়, ইসলামে তার বিপরীত মত প্রকাশ করা হয় যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে পবিত্র হয়ে এবং তার ভিতরে থাকে পূর্ণতার সম্ভাবনা। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ.

"নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করি সর্বোত্তম উপাদানে।" (সূরা ৯৫ : ৪)।

কিন্তু তার পরক্ষণেই আয়াতে বলা হয়েছে :

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ.

"এবং পরে আমি তাকে নীচ থেকে নীচতম পর্যায়ে আনয়ন করি, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে ব্যতীত।" (সূরা ৯৫ : ৫-৬)।

এই আয়াতে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, মূলের দিক দিয়ে মানুষ সৎ ও পবিত্র; এবং আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বাস ও সৎকর্মের অভাব তার মৌলিক পূর্ণতা ক্ষুণ্ন করে। পক্ষান্তরে, মানুষ যদি আল্লাহ্‌র একত্ব সচেতনভাবে উপলব্ধি করে এবং তাঁর কানুনের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে সে তার মৌলিক ব্যক্তিগত পূর্ণতা রক্ষা করতে অথবা পুনরায় অর্জন করতে পারে। এমনকি করে যা কিছু মন্দ, তা ইসলামে অপরিহার্য নয়, এমন কি মৌলিকও নয়; তা হচ্ছে মানুষের পরবর্তী জীবনের অর্জিত এবং তার কারণ হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সহজাত নির্দিষ্ট গুণের অপব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই গুণসমূহ স্বতন্ত্র, কিন্তু সম্ভাবনার দিক দিয়ে তা সর্বদা স্বয়ংসম্পূর্ণ; এবং দুনিয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে তাদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। আমরা স্বীকার করে নেই যে, চিন্তা ও অনুভূতির সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থার দরুন মৃত্যুর পরবর্তী

জীবন আমাদেরকে এনে দেবে অন্যবিধ সম্পূর্ণ নতুন গুণ ও শক্তি, যাতে করে আরো বেশী করে মানবাত্মার অগ্রগতি সম্ভব হবে; কিন্তু এ হচ্ছে কেবল আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কিত ব্যাপার। ইসলামী শিক্ষায় আমরা নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাই যে, এই পার্থিব জীবনেও আমাদের প্রত্যেকেই পরিপূর্ণ মাত্রায় পূর্ণতার অধিকারী হতে পারি, যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিত্বের উপাদানসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করি।

সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মুহূর্তের জন্য আত্মিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ব্যাহত না করে মানুষের জন্য পার্থিব জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। খ্রিষ্টীয় ধারণা থেকে এ ধারণা বেশী স্বতন্ত্র। খ্রিষ্টীয় ধর্মমত অনুসারে মানব জাতি আদম ও হাওয়ার কৃত অপরাধের উত্তরাধিকার বহন করে হোঁচট খাচ্ছে এবং তার পরিণামে সমগ্র জীবনকে বিবেচনা করা হচ্ছে দুঃখের অন্ধকার উপত্যকা হিসাবে, অন্তত ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিতে। জীবন হচ্ছে দুই বিরোধী শক্তির সংগ্রাম ক্ষেত্র : অমঙ্গলের প্রতীক শয়তান ও কল্যাণের প্রতীক যীশুখ্রিস্ট। দৈহিক লোভ দেখিয়ে শয়তান ব্যাহত করছে চিরন্তন আলোকের পথে মানবাত্মার অগ্রগতি; আত্মা হচ্ছে খ্রিস্টের অধিকারে, আর দেহ হচ্ছে শয়তানী প্রভাবের লীলাভূমি। আলাদাভাবে বলা যায় যে, বস্তু জগৎ হচ্ছে অপরিহার্যরূপে শয়তানী, আর আত্মিক জগৎ হচ্ছে আল্লাহ্‌ময় ও সৎ। মানব প্রকৃতিতে যা কিছু দৈহিক (material) অথবা খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে যাকে বলা হয়, রক্তমাংসের দেহসংক্রান্ত (Carnal), তা হচ্ছে অন্ধকার ও বস্তু জগতের নারকীয় অধিপতির (শয়তান) মন্ত্রণার ফলে আদমের পতনের প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য মানুষের আত্মাকে ফিরাতে হবে রক্ত-মাংসের দুনিয়া থেকে ভবিষ্যৎ আত্মিক জগতের দিকে, যেখানে ক্রুসবিদ্ধ খ্রিস্টের আত্মবিসর্জনের ফলে 'মানব জাতির পাপের' প্রায়শ্চিত্ত হয়।

যদিও এই ধর্মমত কখনো বাস্তবে প্রতিপালিত হয় না বা হয় নি, তথাপি এই ধরনের শিক্ষার অস্তিত্বই তো ধর্মপ্রবণ মানুষের মধ্যে একটা অসৎ মনের স্থায়ী ধারণা সৃষ্টি করে তোলে। একদিকে দুনিয়াকে উপেক্ষা করার জরুরী আহ্বান ও অপরদিকে বাঁচবার ও বর্তমান জীবনকে উপভোগ করার জন্য অন্তরের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা—এই দুয়ের মাঝখানে সে থাকে দোদুল্যমান অবস্থায়। উত্তরাধিকার বলেই অপরিহার্য পাপের ধারণা এবং সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির কাছে অবোধ্য ক্রুসবিদ্ধ যীশুর দুঃখভোগের মাধ্যমে মানবের পাপমুক্তির ধারণা মানুষের আত্মিক চাহিদা ও তার বাঁচার ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক বাধার প্রাচীর গড়ে তোলে।

ইসলামে কোনো মৌলিক পাপের সন্ধান আমরা পাই না; এ ধরনের ধারণাকে আমরা মনে করি আল্লাহ্‌র বিচারের ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যমূলক। আল্লাহ্ পিতার

কৃতকর্মের জন্য সন্তানকে দায়ী করেন না; তা হলে কি করে তিনি এক সুদূর পূর্বপুরুষের কৃত অবাধ্যতার পাপের জন্য দায়ী করতে পারেন অসংখ্য পুরুষ ধরে সকল মানুষকে? এই বিচিত্র ধারণার দার্শনিক ব্যাখ্যা গড়ে তোলা নিঃসন্দেহে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিবৃত্তির কাছে এ ধারণা সব সময়েই থাকবে কৃত্রিম ও ত্রিত্ববাদের ধারণার মতো অসন্তোষজনক। ইসলামের শিক্ষায় যেমন নেই কোনো পাপের উত্তরাধিকার, তেমনি নেই মানব জাতির সার্বজনীন পাপমুক্তির অবকাশ। মুক্তি ও পতন দুই-ই ব্যক্তিগত। প্রত্যেক মুসলিমই তার নিজের মুক্তিদাতা; তার অন্তরেই রয়েছে তার আত্মিক সাফল্য ও ব্যর্থতার সকল সম্ভাবনা। মানব-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ.

"তার পক্ষে রয়েছে তাই, যা সে অর্জন করেছে আর তার বিরুদ্ধে রয়েছে তাই যার জন্য সে দায়ী।" (সূরা ২ : ২৮৬)।

অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى.

"মানুষ যার জন্য সংগ্রাম করেছে, তা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই গণ্য করা হবে না।" (সূরা ৫৩ : ৩৯)।

ইসলাম যদিও খ্রিষ্টধর্মের মতো জীবনে অন্ধকার দিকটাই মানুষের সামনে তুলে ধরে না, তথাপি আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার মতো পার্থিব জীবনের উপর অত্যধিক বাহুল্যপূর্ণ মূল্য আরোপ করতেও সে নিষেধ করে। খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যেখানে পার্থিব জীবন অবাঞ্ছিত, তেমনি আধুনিক পশ্চিম খ্রিষ্টধর্ম থেকে আলাদা ধারায় জীবনকে এমনভাবে পূজা করে, যেমন পেটুক পূজা করে তার খাদ্যবস্তুকে, যদিও সে তা গলাধঃকরণ করে, তবু তাকে কোনো মর্যাদা সে দেয় না। পক্ষান্তরে, ইসলাম পার্থিব জীবনকে দেখে প্রশান্তি ও মর্যাদার দৃষ্টিতে। ইসলাম তার পূজা করে না, বরং তাকে মনে করে আমাদের উচ্চতর অস্তিত্বের পথে একটা আঙ্গিক পর্যায়। কিন্তু যেহেতু এটা একটা পর্যায় এবং প্রয়োজনীয় পর্যায়ও বটে, সুতরাং পার্থিব জীবনকে উপেক্ষা করার অথবা তার মূল্য ছোট করে দেখার অধিকার মানুষের নেই। এই দুনিয়ায় আমাদের সফর আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার এক প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট অংশ। সুতরাং মানব-জীবনের রয়েছে এক বিরাট মূল্য; কিন্তু আমাদের কখনো ভুললে চলবে না যে, এ হচ্ছে নিছক যান্ত্রিক ধরনের মূল্য। আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য যেমন বলে—'আমার রাজত্ব কেবল এই দুনিয়াকে নিয়ে'—ইসলামে তেমন কোনো আপসবাদের স্থান নেই; তেমনি খ্রিষ্টধর্মের মতো 'আমার রাজত্ব এ দুনিয়ার নয়' বলে জীবনকে উপেক্ষা করার পক্ষপাতীও ইসলাম নয়। ইসলাম মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে এদিক দিয়ে। কুরআন শরীফ আমাদেরকে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে :

رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الاٰخِرَةِ حَسَنَةً.

"হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদেরকে কল্যাণ দান কর দুনিয়ায় এবং কল্যাণ দান করো আখেরাতে।" (সূরা ২ : ২০১) এমনি করে এই দুনিয়া ও তার কল্যাণের পূর্ণ উপলব্ধি কোনোক্রমেই আমাদের আত্মিক প্রচেষ্টার পথে বাধা সৃষ্টি করে না। বস্তুবাদী অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়, যদিও তা আমাদের লক্ষ্য নয়। আমাদের সর্বপ্রকার বাস্তব কার্যকলাপের লক্ষ্য হবে এমন ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি ও সংরক্ষণ, যা মানুষের নৈতিক শক্তির ক্রমবিকাশের সহায়ক হতে পারে। এ নীতি অনুসারে মানুষ বড়ছোট যে কোনো কাজই করুক না কেন, তার ভিতরে একটা নৈতিক দায়িত্বের চেতনার পথে ইসলাম তাকে চালিত করে। 'সীজারের পাওনা সীজারকে দাও, আর আল্লাহ্‌র পাওনা আল্লাহকে দাও' : খ্রিষ্টীয় সুসমাচারের এই জরুরী নির্দেশের স্থান নেই ইসলামের ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যে; কারণ ইসলাম আমাদের নৈতিক এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে কোনোরূপ সংঘাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। যে কোনো ক্ষেত্রে একটিমাত্র নির্বাচনের অবকাশ রয়েছে : ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে নির্বাচন, আর কোন মধ্যপন্থা নেই। সুতরাং কর্মের তাগিদই হচ্ছে নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের চারপাশে যে, সব ঘটনা ঘটছে, তার জন্য নিজকে দায়ী মনে করতে হবে এবং প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে। কুরআনের আয়াতে এই মনোভাব অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ.

"তোমরাই হচ্ছো মানব জাতির কাছে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় (উম্মত); তোমরা ন্যায় কার্যের নির্দেশ দান কর ও অন্যায়কে প্রতিরোধ কর; এবং তোমরা ঈমান পোষণ কর আল্লাহ্‌র উপর।" (সূরা ৩ : ১১০)।

এ হচ্ছে ইসলামের আক্রমণাত্মক কর্মবাদের নৈতিক যৌক্তিকতা, ইসলামের প্রাথমিক বিজয় ও তার তথাকথিত 'সাম্রাজ্যবাদের' সঙ্গতি। যদি আপনারা 'সাম্রাজ্যবাদী' শব্দটিই প্রয়োগ করতে চান, তা হলে ইসলাম 'সাম্রাজ্যবাদী'ই ছিল, কিন্তু এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যের স্পৃহা দ্বারা প্রবুদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক বা জাতীয় স্বার্থপরতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, অপর জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে মুসলিমদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লোভ এর ভিতরে নেই; অথবা এর ভিতরে কোনো অবিশ্বাসীকে বলপূর্বক ইসলামে দীক্ষা দেবার গরজও ছিল না কখনো। আজকের মতো তখনো এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল মানুষের সর্বোত্তম আত্মিক বিকাশের জন্য পার্থিব কাঠামো তৈরি করা। কারণ ইসলামের শিক্ষা অনুসারে নৈতিক জ্ঞান মানুষের উপর নৈতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ন্যায়ের অগ্রগতি ও অন্যায়ের ধ্বংস বিধানের চেষ্টা ব্যতীত ন্যায়-অন্যায়ের নিছক প্লেটোবাদী চিন্তা নিজেই জঘন্যভাবে নৈতিকতার বিরোধী। ইসলামে দুনিয়ায় নৈতিকতার বিজয় প্রতিষ্ঠার মানবীয় প্রচেষ্টার উপরই নির্ভর করে তার জীবন-মরণ।